অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 11 - 2023

ঔপনিবেশিক শাসন ও বাঁকুড়ার ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা

সাথী মন্ডল
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 11 originally published online November 2023

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2023 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol.11 : 2023 | **ISSN 2347-8055**

ঔপনিবেশিক শাসন ও বাঁকুড়ার ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা

সাথী মন্ডল

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সংক্ষিপ্তসার

কৃষির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল সেচ। সমস্ত প্রানীদের মতো গাছেরও বেঁচে থাকার জন্য জল ভীষণভাবে প্রয়োজন। খরার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়। রুক্ষ-শুষ্ক জমিতে ফসল উৎপাদনের একমাত্র উপায় কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা। সেই হিসেবে বাঁকুড়ার মাটিতে ফসল উৎপাদনের অন্যতম উপায় হল সেচের প্রসার। প্রাচীন কালে এই জেলায় প্রথম বসতির সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। নদীর তীরে বসতি গড়ে তোলার অন্যতম কারণ হয়ত ছিল কৃষিতে সেচের যোগানের সহজলভ্যতা। মল্ল যুগেও দেখা যায় মল্ল শাসকগণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ খনন করা হয়েছিল প্রচুর জলাশয়। এই জেলার সেচ ব্যবস্থা বরাবরই বাঁধ ও পুষ্করিনী নির্ভর ছিল। মল্ল যুগে সেচের সুবিধার জন্য খনন করা হয়েছিল 'শুভঙ্কর দাঁড়া' যা বিস্তৃত অঞ্চলকে শস্য শ্যামলা করে তুলেছিল। ব্রিটিশ সরকার সেচের উন্নতি কল্পে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। খুব প্রয়োজন ছাড়া সরকার নতুন খাল খননে বা পুরাতন সেচখাল সংস্কারে অর্থ ব্যয় করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করত না। আবার যে সীমিত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হত তাও পুরোপুরি বিনিয়োগ করা হত না। ফলে সরকারি উদ্যোগ তেমন না থাকায় সেচের উন্নতি কল্পে এগিয়ে এসেছিল সেচ সমবায় সমিতি। ঔপনিবেশিক পর্বে বহু সেচ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল, যেগুলির সাহায্যে অনেক পুরাতন সেচখাল, পুকুর সংস্কার করে পুনরায় সেচ যোগ্য করে তোলা হয়েছিল। সরকারের সেচের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করে 'Tanks Improvement Act' প্রনয়ণ করা হয়েছিল। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় রুক্ষ-শুষ্ক বাঁকুড়ার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সেচের প্রসারের প্রয়োজন ছিল তা তৎকালীন সময়ে হয়ে ওঠেনি।

সেচ হল কৃষির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সেচ ব্যতীত ফসল ফলানো কোনোভাবেই সম্ভব নয় মানুষের মতো গাছেরও বেঁচে থাকার জন্য জল ভীষণভাবে প্রয়োজন । জলের অভাবের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়। সেচ হল জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম ভাবে জল সরবরাহ ব্যবস্থা। কম বৃষ্টিপাত বা অনাবৃষ্টির কারণে অনেক সময় উৎপাদন ব্যাহত হয়, তাই জলের অভাবে যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয় সেই কারণে কৃত্রিম ভাবে জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। যা সেচ ব্যবস্থা নামে পরিচিত। গাছের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার ও ভালোভাবে ফলনের জন্য জমিতে সেচ দেওয়া হয়। সাধারণত নদী, পুকুর, বাঁধ, কুয়ো প্রভৃতি উৎস থেকে জল সংগ্রহ করে জমিতে সেচ দেওয়া হয়। কৃষি ব্যবস্থায় বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন সেচ দেওয়া হয়, তেমনই বিভিন্ন ধরনের সেচ ব্যবস্থাও ব্যবহৃত হয়। মূলত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয়। একটি হল সনাতন পদ্ধতি ও দ্বিতীয়টি হল আধুনিক পদ্ধতি। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ নিজে আবার কখনো পশুশক্তিকে ব্যবহার করে সেচের কাজ সম্পন্ন

করত। তবে বর্তমানে ভৌম জলের অপচয় রোধ করার জন্য অল্প জলে অধিক ফসল উৎপাদনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বর্তমানে বাঁকুড়াতে সনাতন ও আধুনিক দুই ধরনের সেচই প্রচলিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে সেচের প্রয়োজনীতা কেন? এর উত্তরে বলা যায় আমাদের দেশে প্রত্যেক ঋতুতে পৃথক পৃথক ফসল উৎপন্ন হয়। আর বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে তেমন বৃষ্টিপাত না হওয়ায় জলের প্রয়োজন হয়। আর সেই অভাব মেটানোর জন্যই জমিতে সেচের প্রয়োজন পড়ে। সেচের প্রয়োগের ফলে যেমন আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব, তেমনই অধিক ফসল উৎপাদনও সম্ভব। আবার জমি সরস থাকলে জমির অন্যান্য আরও উপকারিতা পাওয়া যায়। সঠিক সময়ে পরিমাণমতো জলের যোগানই অধিক ফলনের অন্যতম কারণ। আর এই জলের যোগান কেবলমাত্র সেচের মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ কৃষিতে সেচের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাচীন কালে মানুষ নিজেদের শারীরিক শ্রম হ্রাস করার জন্য সহজলভ্য উপকরণ দিয়েই সেচের কাজ সম্পন্ন করত। পৃথিবীর প্রাচীন সব সভ্যতা নদীর তীরে গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ ছিল সেচের সহজলভ্যতা। সেই হিসেবে ভারতীয় সভ্যতায় সেচ ব্যবস্থার ইতিহাস অতি প্রাচীন। পুরান, বেদ, মহাভারত, রামায়ণ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে সেচের উৎস ও সেচ ব্যবস্থার নানা দিকের উল্লেখ রয়েছে। 'কৃষি পরাশর' গ্রন্থেও সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। জমি উর্বর হোক বা রুক্ষ-শুষ্ক জমিতে সেচের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। এখন বাঁকুড়ার কৃষিতে সেচের প্রয়োজন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করা যেতে পারে। বাঁকুড়াতে তুলনামূলক ভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম আবার মাটির গঠনের কারণে জল গড়িয়ে নীচের দিকে চলে যায়। ফলে জল তেমনভাবে জমা থাকতে পারে না। এই কারণে বাঁকুড়ার নদী গুলিও বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে প্রায় শুকনো থাকে। জেলার বিষ্ণুপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, জয়পুর, সোনামুখী প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ জমি সমতল ও উর্বর হলেও বাঁকুড়া সদর মহকুমা ও খাতড়া মহকুমার খুব কম পরিমাণ জমি উর্বর। কারণ এখানে বেশিরভাগ জমি রুক্ষ, কাঁকরযুক্ত । তাই অনাবাদী জমির পরিমাণও এই অঞ্চলে বেশি। জেলার সব জমি সেচসেবিত করা সম্ভব হলে যে পরিমাণ জমিতে চাষাবাদ হয় তার দ্বিগুন পরিমাণ জমি আবাদযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রচুর উৎপাদনের নিশ্চয়তাও তৈরি হয়নি। জলের অভাবের কারণে প্রতি বছর ভালো মানের উৎপাদন সম্ভবপর না হওয়ায় জেলাটিতে প্রতিনিয়তই দুর্ভিক্ষ দেখা যেত । এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও জেলার প্রচুর সংখ্যক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ফলে কৃষি জেলার প্রধান জীবিকা হওয়ায় কৃষির উন্নতি কল্পে এ জেলার মানুষ যেমন সদা তৎপর ছিল, তেমনি শাসকগনও ছিল সদা তৎপর। প্রাচীন কাল থেকেই জেলার কৃষির উন্নতির জন্য সেচের প্রতি শাসকরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গুপ্ত যুগে বাঁকুড়ার কৃষি সমৃদ্ধির কথা লোকগানের মাধ্যমে জানা যায়। সে সময় পুষ্করন ছিল খাদ্যে উদ্বৃত্ত ও সমৃদ্ধ। বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত একটি লোকগান থেকে এও জানা যায় যে পোখরনা বা পুষ্করনে চার মাস বর্ষা হত। হয়ত এই কারণেই পোখরনা ছিল খাদ্যে সমৃদ্ধ ও উদ্বৃত্ত। মল্ল যুগেও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচের প্রতি শাসকদের যে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল তৎকালীন সময়ে খনন করা জলাশয় গুলোই তার প্রমান। বাঁধ, পুষ্করিনী ছাড়াও জোড় গুলিও ছিল এই জেলার সেচের বড় উৎস। প্রতিটি জলাশয়ের সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। আর এর কারণ প্রামাণ্য তথ্যের অভাব।

মল্ল যুগে এই জেলাকে শস্য শ্যামলা করে তোলার জন্য বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল ।মল্ল রাজ গোপাল সিংহের সময় তার মন্ত্রী শুভঙ্করের তত্ত্বাবধানে আসুরিয়া থেকে রামপুর পর্যন্ত প্রায় ২০ মাইল দীর্ঘ 'শুভঙ্কর দাঁড়া' খনন করা হয়েছিল। যার ফলে বিস্তৃত এলাকা শস্য শ্যামলা হয়ে উঠেছিল। অমিয় কুমার ব্যানার্জির মতে এই দাঁড়া নির্মানের ফলে সোনামুখী থেকে বড়জোড়ার মধ্যবর্তী ৯৪ বর্গ মাইল এলাকা সেচসেবিত হয়েছিল এবং রবার্টসনের মতে এর দ্বারা ৭৫ বর্গ মাইল এলাকা সেচসেবিত হয়েছিল।[১] এই অঞ্চলের মতো দক্ষিণ বাঁকুড়াতেও বেশ কিছু সেচ খালের কথা জানা যায়। ফার্গুসন সাহেব দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল অভিযানের সময় এই অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে যা দেখেছিলেন তা তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন। তা থেকেই জানা যায় রাইপুরের যমুনা বাঁধ থেকে ঐ এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেচসেবিত ছিল এবং ফার্গুসন সাহেব তাঁর রিপোর্টে এই অঞ্চলের উৎপাদন সম্পর্কেও প্রশংসা করেছিলেন।

বাঁকুড়া জেলায় একটা সময় দুর্ভিক্ষ ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। বাংলাকে বরাবর শস্য শ্যামলা বলা হলেও ঔপনিবেশিক পর্বে এটা খুব একটা প্রযোজ্য ছিল না। কারণ এই যুগে সমস্ত বাংলা ব্রিটিশদের শোষণ সহ বিভিন্ন কারণে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলে পরিনত হয়। বাঁকুড়াও এই অবস্থার মধ্যেই ছিল। বাঁকুড়াতে এই যুগে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব যে কী পরিমানে ছিল তা ১৮৬৬ - ১৯৪৪ সালের মধ্যে ঘটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। কোম্পানির অর্থলিপ্সা জেলার অর্থনৈতিক অবস্থাকে করেছিল আরো বেশি শোচনীয়। জেলার কিছু অংশ বাদে অধিকাংশ স্থানেই জলের অভাব, ফলে চাষের জন্য তো অবশ্যই, গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের অভাবও দেখা যায় ভীষণভাবে। ফলে গ্রীষ্মকালে কৃষকের সাথে সাথে সাধারণ মানুষকেও চরম বিপাকে পড়তে হয়। এই জলকে কেন্দ্র করেই জেলার মানুষকে বারবার দুর্ভিক্ষ, অজন্মা ও খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অর্থাৎ এই জেলার কৃষির পশ্চাদপদতার জন্য জলাভাব যে অন্যতম কারণ ছিল তা বলাই বাহুল্য। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বহু কৃষককে জমিহারাও হতে হয়েছিল। রবার্টসনের লেখাতে কৃষকের দারিদ্র্যের করুণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। কৃষকদের এই দুর্গতি নিরসনে ঔপনিবেশিক শাসকদের তৎপরতা ছিল যথেষ্ট কম। কৃষকের দারিদ্র্যের কারণ ছিল ঋণের দায়ে সবচেয়ে উর্বর জমি মহাজনদের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া। ভালো জমি হাতছাড়া হয়ে পড়ায় অনুর্বর জমিতে কৃষক চাষাবাদ করতে বাধ্য হত। আর এই ধরনের জমিতে উৎপাদন যথেষ্ট হত না কিন্তু খাজনা দিতে তারা বাধ্য ছিল। ফলে তাদের হাতে তেমন অবশিষ্ট না থাকায় তারা দ্রুত ভূমিদাসে পরিনত হতে থাকে। অর্থাৎ বাঁকুড়ার কৃষকদের দুর্দশার জন্য যেমন দায়ী ছিল সেচের অভাব, তেমনই সেচের প্রসারে বাধা ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের সদিচ্ছার অভাব।

ঔপনিবেশিক আমলের ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার বর্ননা আলোচনার পূর্বে তৎকালীন সময়ে জেলার বৃহৎ সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কেও সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। জেলায় মল্ল যুগ থেকেই শুভঙ্করী দাঁড়া সেচের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু কালের নিয়মে এই দাঁড়া মজে যেতে থাকে। প্রাক ঔপনিবেশিক পর্বে বিভিন্ন গ্রামের জমিদার ও উচ্চবিত্ত কৃষকেরা এই জেলায় প্রচুর জলাশয় খনন করান। কিন্তু দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে সেগুলিও মজে যেতে থাকে। ফলে ঔপনিবেশিক আমলে সেচ ব্যবস্থা কিছুটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে পড়ে। তবে এই সময়পর্বে জলসেচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল জেলার কিছু নদী। যেমন, দামোদরের

উপনদী শালী, সোনামুখী ও পাত্রসায়ের থানার বিস্তৃত অঞ্চলের জলসেচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২] গ্রীষ্মকালে তেমন সুবিধা পাওয়া না গেলেও বাকি সময় কুমারী, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বরের উপনদী বিরাই প্রভৃতি নদী গুলি কৃষির সেচকার্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই জলের যোগান ও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে ঔপনিবেশিক পর্বে পূর্বের নির্মিত খাল গুলি সংস্কার ও নতুন খাল খননের উদ্যোগ কিছু ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে এগুলি রূপায়িত হয়েছিল আবার কিছু ক্ষেত্রে অর্থের অভাবকে যুক্তি খাড়া করে এগুলোর রূপায়ণ সম্ভবপর হয়নি। যেমন, বাঁকুড়া জেলা গঠনের পর ১৮৮৬ সালে প্রথমবার সরকারিভাবে শুভঙ্কর দাঁড়া সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হলেও ঔপনিবেশিক সরকার সংস্কারের বরাদ্দ অর্থ দিতে রাজি না হওয়ায় খালটি সেই সময় সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। পরে ১৮৯৬-৯৭ সালে সোনামুখী থানার বিস্তৃত অঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্য শস্যহানি দেখা দিলে বিষ্ণুপুর মহকুমার মহকুমা শাসক দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জিকে জেলা কালেকটর জে. ঈ. ম্যানিস্টি এই খাল সংস্কারের নির্দেশ দেন।[৩] যদিও বরাদ্দ অর্থের পুরো অংশ ব্যয় করা হয়নি। আবার পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও সরকারের তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি।

ঔপনিবেশিক সরকার সেচের প্রতি যে সামান্য প্রয়াস গ্রহন করেছিল তাতে পুরাতন খাল সংস্কারের পাশাপাশি নতুন কিছু প্রকল্পও গৃহীত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল বেশকিছু ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কুলাই খাল (সিমলাপাল), পলাশবনী খাল (অম্বিকানগর), হরিণমুড়ি খাল (রাধানগর), আমজোড় খাল (তালডাংরা), বিড়াই খাল (ওন্দা), ছাগলকুটা খাল (ছাতনা), রুক্মিণী খাল (তালডাংরা), মোলবাঁধ সেচ প্রকল্প।[৪] সেচকার্যের উন্নতিতে গ্রামের জমিদারগণও পিছিয়ে ছিলেন না। এককথায় সরকারের অবহেলা জেলাবাসীরাই মিটিয়ে জেলার কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতেন। এতে জমিদার, স্থানীয় মানুষ, জলসেচ সমবায় সমিতি সবাই যুক্ত ছিলেন। যেমন, সিমলাপালের জমিদার সেচের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে কুলাই খাল নামক একটি কৃত্রিম নদীখাল খনন করান। তবে পরবর্তী কালে এই খালটি মজে যেতে থাকলেও সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। স্বাধীনতার পর সংস্কারের মাধ্যমে খালটিকে পুনরায় সেচের উপযোগী করে তোলা হয়। জেলার অপর একটি নদীখাল হল অম্বিকানগরের পলাশবনী খাল। জেলার দক্ষিণ অংশ সবচেয়ে বেশি খরাপ্রবন, তাই সরকার এক্ষেত্রে সেচের সমস্যার সমাধান কল্পে খাল খননের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১৯১৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় এই খাল বাঁধ নির্মিত হয়।[৫] বর্ষাকালে জঙ্গলমহলের বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ন জমির জল বিভিন্ন নদীতে পড়ে বয়ে যেত। খরাপ্রবন এই অঞ্চলের সেচের কথা ভেবে এই বয়ে যাওয়া জলকেই কৃষিতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কালেক্টর A. W. Cook পলাশবনী থেকে জয়নগর পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ মাইল অঞ্চল জুড়ে ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে ক্যানেল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৬] এই অসম্পূর্ণ খাল থেকেই ঐ অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির প্রায় ১১০০ বিঘা জমি জলসেচনের সুবিধা পায়।[৭] এই ক্যানেল থেকে সেচের কারণে ঐ এলাকার বহু পতিত জমি আবাদযোগ্য হয়ে উঠেছিল এবং এর ফলে ধানের পাশাপাশি গম, আলু, ইক্ষুর উৎপাদন শুরু হয়েছিল।[৮] তবে পরবর্তী কালে এটিও মজে গিয়ে সেচের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে সেচের প্রসারে সমবায় সমিতিগুলিও পিছিয়ে ছিল না। তার প্রমাণ ছিল রাধানগরের হরিণমুড়ি খাল প্রকল্প। শালবাঁধ সোসাইটির দায়িত্বে ৫০,০০০ টাকা এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হলেও ১৯২৪ সালের মধ্যে মাত্র ১০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।[৯] এই খাল সম্পূর্ণ নির্মানের ফলে স্থানীয় ৫০০০ বিঘা জমিকে

সেচের অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব হত বলে আশা করা হয়েছিল।[১০] সেচ সমবায় সমিতির উদ্যোগে তালডাংরাতেও একটি সেচ প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল, যার নাম ছিল আমজোড় খাল প্রকল্প। আমজোড় গুরুসদয় সোসাইটির দায়িত্বে এই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রায় ২০০০ বিঘা জমিতে এর দ্বারা সেচের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হয়েছিল।[১১] তবে বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরই বর্ষার স্রোতে এই খালের অর্ধেক অংশ ভেঙে পড়ে। দীর্ঘদিন যাবৎ মাটির বাঁধ তৈরি করে স্থানীয় বাসিন্দারা সেচের কাজ চালানোর পর ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ও সমিতির আর্থিক আনুকূল্যে এখানে পাকা বাঁধ তৈরি হয়। যার ফলে ৭০০ একর জমি সেচের অধীনে আসে।[১২] ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ যে এ জেলার সেচের প্রসারে খুব একটা আগ্রহী ছিল না তা কয়েকটি অসম্পূর্ণ খাল পরিকল্পনার থেকে বোঝা যায়। সেগুলো হল বিড়াই খাল, ছাগলকুটা খাল, রুক্মিণী খাল ইত্যাদি। এই সমস্ত খাল প্রকল্প গুলো গৃহীত হয়েছিল ঔপনিবেশিক পর্বে, কিন্তু ব্যয়ের কারনে কোন প্রকল্পই বাস্তবায়িত হয়নি। এই সব প্রকল্পের কাজ শুরু হয় স্বাধীনোত্তর পর্বে। এমনকি জেলাবাসীদের কাতর অনুরোধেও সরকার কর্ণপাত করেনি।

সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও জল সরবরাহ সমিতির উদ্যোগে কিছু খাল বাঁধ তৈরি হয়েছিল, যার সাহায্যে বিস্তৃত এলাকা সেচসেবিত হয়েছিল । বাঁকুড়াতে মূলত ১৯২০ সাল থেকে জলসেচ সমবায় সমিতি গঠিত হতে শুরু করে।[১৩] প্রতিটি থানায় যেখানে জোড় আছে এমন স্থানে এই সমিতিগুলি গঠন করা হত। ১৯২৪ সালের মধ্যে সমিতিগুলির দ্বারা ৩৪ টি জলসেচ পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং ৪৫ টি নতুন পরিকল্পনার কাজও শুরু হয়েছিল।[১৪] কাজের অগ্রগতি দেখে ধীরে ধীরে সমগ্র জেলাতেই এই সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৫ সালে এই ধরনের সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৮ টিতে।[১৫] জল সরবরাহের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্তের নাম এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, যে তালডাংরা থানার পাঁচমুড়াতে তাঁর নামানুসারে জল সরবরাহ সমবায় সমিতিটি গড়ে ওঠে।

বাঁকুড়ার সেচ ব্যবস্থা সবথেকে বেশি নির্ভরশীল ছিল বাঁধ ও পুকুরের উপর। ঔপনিবেশিক পর্বে এই ধরনের নদী বাঁধ নির্মিত হওয়ার পূর্বে সমস্ত জেলা জুড়ে খনন করা হত ছোট বড় অনেক পুষ্করিনী, বাঁধ। যেগুলি স্থানীয় মানুষদের ব্যবহারের পাশাপাশি সেচের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল। বাঁকুড়া সদর ও খাতড়া মহকুমার জমি উঁচু নিচু হওয়ায় বাঁধ নির্মাণে যেমন সুবিধা ছিল তেমনি অসুবিধাও ছিল। কারণ উচ্চভূমির জল গড়িয়ে এসে জমা হয়ে খুব সহজেই জলাশয় গুলি জলপূর্ণ হত, তবে জলের সাথে মাটি, বালি গড়িয়ে আসার ফলে খুব তাড়াতাড়ি বাঁধগুলি মজেও যেত। ফলে বাঁধ তৈরির থেকে সংস্কারে ব্যয় হত বেশি। বিষ্ণুপুর মহকুমার ভূমি তুলনায় সমতল হওয়ায় এখানকার শাসকগন পুষ্করিনী খননকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কারণেই হয়তো বিষ্ণুপুর শহরে বাঁধের সংখ্যা অনেক বেশি। এতে আত্মরক্ষার পাশাপাশি জনসাধারণের ব্যবহার, সেচ প্রভৃতি কাজও হত। তবে ঔপনিবেশিক পর্বে সরকারের পক্ষ থেকে পুকুর সংস্কারে তেমন সাড়া না পাওয়া গেলে কৃষকেরা নিজেদের উদ্যোগে নিজেরাই সংস্কারের কাজ করতেন। আবার কখনো সমবায় সমিতির উদ্যোগেও পুরাতন মজে যাওয়া বাঁধের সংস্কার করা হত। অর্থাৎ জলসেচ সমবায় সমিতি গুলো শুধু নদী বাঁধ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাই নয়, বাঁধ সংস্কারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের উদ্যোগে যেসব স্থানে পুরাতন বাঁধ সংস্কারের কাজ হয়েছিল সেখানে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রবার্টসন তাঁর রিপোর্টে বেশ কিছু খাল বাঁধ পরিকল্পনার কথা ও পুকুরের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলি নির্মাণের ফলে বহু পতিত জমি

সেচসেবিত হয়ে আবাদযোগ্য হয়ে উঠেছিল। আর এই কাজের উদ্যোক্তা ছিল জেলার জলসেচ সমবায় সমিতি গুলি। এগুলির মধ্যে রবার্টসন রাইপুর থানার যমুনাবাঁধ ও পাত্রসায়ের থানার দানা দিঘীর কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো খননের দ্বারা ঐ অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত ফসলের বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিল। জেলায় ধান ছাড়াও গম, বিভিন্ন তৈলবীজ, ডাল, শাকসবজি ইত্যাদি উৎপাদিত হতে থাকে। কৃষক ও স্থানীয় সাধারণ মানুষদের জলসেচ সমবায় সমিতিগুলি গড়ে তোলার একমাত্র কারণ ছিল সারাবছর কৃষিতে জলের যোগান অব্যাহত রাখা। যাতে বর্ষাকাল ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ও কৃষিকাজ অব্যাহত থাকে। সেচ সমবায় সমিতিগুলির উদ্যোগে পুকুর সংস্কারের কাজ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রবার্টসনের হিসেব অনুযায়ী ১৯২৪-২৬ সালে বাঁকুড়াতে ৯০০০ একর জমি সেচসেবিত হয়েছিল।[১৬] ১৯২৯ সালে এর সংখ্যা ছিল ৭৩৮, যা ১৯৩৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮৬ টিতে পৌঁছায়।[১৭] তবে যে উৎসাহ নিয়ে এই সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল বা প্রথম দিকে যে পরিমাণ কাজ হয়েছিল তার গতি ক্রমশ শ্লথ হয়ে পড়ে। ফলে ক্রমশ এই ধরনের সমিতির সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। অনেক সমিতি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

বাঁকুড়ার কৃষিতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির রূপায়ন কৃষি ব্যবস্থাকে অনেক সাফল্য প্রদান করেছিল। মজে যাওয়া বাঁধের সংস্কার ও নতুন নতুন নদী বাঁধ নির্মাণের ফলে জলাধার গুলির জলধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে জেলার সর্বত্র সেচের জলের সমস্যার অনেকাংশে সমাধান ঘটে। জেলায় বেশ কিছু বৎসর খাদ্যাভাব দেখা দেয়নি বা অনটন গুলি তীব্র আকার ধারণ করেনি। নদীবাঁধ নির্মাণ, জলাশয় সংস্কারের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন অংশে অনেক কূপও খনন করা হয়েছিল। নীচের সারনী থেকে ১৯০৮-১৯৩৯ সালের মধ্যে জেলায় সেচের কোন মাধ্যম থেকে কত পরিমাণ জমি সেচসেবিত হয়েছিল তা আলোচনা করা হল। [১৮]

সময়কাল	সরকারি ক্যানেল	বেসরকারি ক্যানেল	পুকুর	কূপ	অন্যান্য মাধ্যম	মোট
১৯০৮-০৯	নেই	০৪	৭৩২০৫	৬৭৭১	২৫৫৮৪	১০৫৫৬৪
১৯০৯-১০	নেই	১৩৪০	৭০৯১৯	৬৮০৩	৭৯২৯	৮৬৯৯১
১৯১০-১১	নেই	১৩৪০	৭০৯১৯	৬৮০৩	৭৯২৯	৮৬৯৯১
১৯১১-১২	নেই	১২০০	৬৯৩৭৬	৫৯০৫	৭২৫০	৮৩৭৩১
১৯১২-১৩	নেই	১২০০	৬৯৩৭৬	৫৯০৫	৭২৫০	৮৩৭১১
১৯১৪-১৫	নেই	১২০০	৬৯৩৭৬	৫৯০৫	৬৫১৫	৮২৯৯৬
১৯১৫-১৬	নেই	১২০০	৬৯৩৭৬	৫৯০৫	৬৫১৫	৮২৯৯৬
১৯১৭-১৮	নেই	১২০০	৭৩৮৭৬	৬৯০৫	৭৮১৫	৮৯৭৯৬

Vol.11 : 2023 | **ISSN 2347-8055**

১৯১৮-১৯	নেই	১৯৮০০	৮৫০০০	৫০০০	১০০০০	১১৯৮০০
১৯১৯-২০	নেই	১০০০০	৭০০০০	৪০০০	৬০০০	৯০০০০
১৯২০-২১	নেই	১০০০০	৭০০০০	৮০০০	১২০০০	১০০০০০
১৯২৮-২৯	নেই	২০০	২১৮৯৪২	১৮৮৮	৫২৩৩	২২৬২৬৩
১৯৩২-৩৩	১৩৬৯	১৯৫১১	৩৪৩১০০	৪২৭০	৪৫১০	৩৭২৭৯০
১৯৩৩-৩৪	-	১৯৫১১	৩৪৩১০০	৪২৭০	৪৫৪০	৩৭১৪২১
১৯৩৪-৩৫	২১৮১	২০০১১	৩৪২৪৪৯	৪৭৬৭	৪৫৫৫	৩৭৩৯৬৩
১৯৩৫-৩৬	২১৭৫	১৯৫১১	১৭৮৪৩৪	২৭৯৮১	৪৫৪০	২৩২৪৬১
১৯৩৬-৩৭	২১৩৮	১৮০০০	৩০৫৫৯০	২৫৫৩২	৪১৩১	৩৫৫৩৯১
১৯৩৭-৩৮	২১৩৮	১৮০০০	৩৫৭১৪৯	২৪৫৯৭	২৮১৬১	৪৩০০৪৫
১৯৩৮-৩৯	২১৩৮	১৮০০	৩৬৯৩৭৫	২২৬৯৭	৪১২০	৪১৬৩৩০

এই সারনী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাঁকুড়াতে পুকুর, কূপ ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে বেশিরভাগ সেচকার্য সম্পন্ন হত। সরকারি ক্যানেল থেকে সেচের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল না। হয়ত বাঁকুড়াকে প্রত্যন্ত অঞ্চল বিবেচনা করে সরকার এই জেলাকে গুরুত্ব কম দিয়ে তুলনামূলক ভাবে কৃষি সমৃদ্ধ জেলাগুলির প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করত। তাই বর্ধমান, মেদিনীপুর জেলার সেচ ব্যবস্থা বেশি গুরুত্ব পেলেও বাঁকুড়া বরাবর ব্রাত্যই থেকে যায়। আর এই কারণেই হয়তো এই জেলায় বেসরকারি ক্যানেল, পুকুর ছিল সেচের উৎস এবং সরকারি ক্যানেল ছিল কম। সাধারণ মানুষ ও সেচ সমবায় সমিতির উদ্যোগে পুকুর, কূপ, বেসরকারি ক্যানেল নির্মিত হওয়ায় এগুলির পরিমাণ ও এগুলি থেকে সেচসেবিত অঞ্চলের পরিমাণও ছিল বেশি।

বাঁকুড়ার সেচের প্রতি সরকারের উদাসীনতা এতটাই বেশি ছিল যে ১৮৮১ সালের পরও জেলায় তেমন সেচের উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়নি। ১৯১৫ সালের দুর্ভিক্ষে জেলার করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে সরকার বেশকিছু বাঁধ খনন ও খাল বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিল। রবার্টসনের সমীক্ষা থেকে জানা যায় এই সময়কালে সরকারের উদ্যোগে সেচের উৎস বৃদ্ধি পাওয়ায় সেচসেবিত এলাকাও বৃদ্ধি পায়। রবার্টসনের সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৯১৭-২৪ এই সময়কালে জেলার কর্ষিত এলাকার পরিমাণ ছিল ৭,৯৬,৯২৬ একর, যার মধ্যে ২,২৫,২৬৩ একর জমি ছিল সেচসেবিত।[১৯] ঈশাকের সমীক্ষায় দেখা যায় এই পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। রবার্টসনের প্রতিবেদনে যেখানে ২৮% এর কিছু বেশি পরিমাণ জমি সেচসেবিত ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে, সেখানে ঈশাকের সমীক্ষায় দেখা যায় এর পরিমাণ হয়েছে ৩৩%।[২০] স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে সেচসেবিত জমির

পরিমাণ বৃদ্ধিতে পতিত জমির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে ও উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ম্যালি তাঁর গ্রন্থে রবার্টসনের সমীক্ষা ও ঈশাকের সমীক্ষার উল্লেখ করে পতিত জমি ও চাষযোগ্য জমির হ্রাস বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। নীচের সারনীতে এই বিষয়টি তুলে ধরা হল।[২১]

	অকৃষিযোগ্য পতিত জমি (একর)	কৃষিযোগ্য পতিত জমি (একর)	বাগিচা (একর)	আমন (একর)	অন্যান্য (একর)	জেলার মোট এলাকা (একর)
১৯২৪ সালের কৃষি সমীক্ষা	৫১৪২৯৯	৩৭৫২৪০	১৬০৬৩	৪৩৯৫৭৪	৩৪৮৮৮৪	১৬৯৪০৬০
১৯৪৪-৪৫ সালের কৃষি সমীক্ষা	৩০৬৪৭	২৭৩৯০৮	১৭৫২৭	৫৭৬৩৮৭	৫১৯৫৯৩	১৬৯৩৮৮৬

এই দুই সারনী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমন ধান উৎপাদক অঞ্চল, অন্যান্য ফসল উৎপাদক অঞ্চল, বাগিচা ফসল উৎপাদক অঞ্চলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর উৎপাদক অঞ্চল বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালের ঈশাকের কৃষি সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ থেকে এই বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয় (জমির পরিমাণ একরে)।[২২]

আমন ধান	৫৭৬৩৮৬.৫৫	বাদাম	২৫.৫৭
আউস ধান	১১১৯২১.৮৩	সরিষা	১৬২৩.৬১
ডাল	২৯৭০.৯৭	তিল	১৭৩২.৬৮
গম	১১০২২.৯৪	লঙ্কা	৩৯২.০৪
বার্লি	১১১৩.৫৩	আলু	২৬২৬.৮৬
মুসুর	১৯২৪.৩৯	পেঁয়াজ - রসুন	২৩৬৪.৩৬
মুগ	৫১৮৩৪.৭	সবজি	৪৮৫৭৫.৭
মাসকলাই	২৬৫.৪৮	পাট	১৭৩.১
খেসারি	৩০৭১.৮২	সূর্যমুখী	১৪০১.০৩

অড়হর	১৭৮৪.০৯১	পান	২১৭.৮১
ভুট্টা	২৪৫১.০৭	তামাক	৩২৯.৪৭
ইক্ষু	২৩৪৪.৫১		

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে জেলায় সরকারি, বেসরকারি, ব্যাক্তিগত সব ধরনের উদ্যোগেই বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। তবে স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে দীর্ঘদিন যাবৎ জলসেচনের প্রধান মাধ্যম ছিল বাঁধ ও পুকুর। সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত ক্যানেল গুলি থেকে জলসেচ প্রচলিত থাকলেও জল সরবরাহ সমিতি গড়ে ওঠার পর খাল বাঁধ গুলি সেচের প্রসারে অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। সরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ঠিকই কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। তুলনায় বেসরকারি উদ্যোগে সেচের উৎস অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল উৎপাদন, যা জেলাবাসীকে অনাহার অর্ধাহার থেকে রক্ষা করেছিল। বাঁধগুলি মজে অগভীর হয়ে পড়ায় সংস্কারের প্রয়োজন ছিল দ্রুত। পাশাপাশি নতুন জলাধার নির্মাণ, জোড় বাঁধ নির্মাণ, গভীর - অগভীর নলকূপ তৈরির প্রয়োজনও ছিল অপরিহার্য। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক শাসকদের উৎসাহ ছিল খুবই কম। বেশ কিছু দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে জেলার উৎপাদন ব্যাহত হলে সরকার সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। যদিও এক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থ ছিল খুবই কম। রাস্তাঘাট নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার এইসময় অর্থ ব্যয়কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ ছিল খাদ্যশস্যের ব্যাপক রপ্তানি। আর এই রপ্তানিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার। খরা, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার কারণে জেলার উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে ব্যাহত না হয় সেই কারণে কিছু ক্ষেত্রে সেচের প্রসারে শাসকগন মনোযোগ দিলেও বাকি সময় তারা ছিলেন উদাসীন। জলাধার সংস্কারের জন্য গ্রামবাসীদের বারবার অনুরোধেও শাসকগন কর্ণপাত করতেন না। অনেকসময় গ্রামবাসীগণ জলসেচ সমিতির উদ্যোগে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সংস্কারের কাজ করত বা নিজেরাই সংস্কারের কাজে লিপ্ত হতেন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সেচ ব্যবস্থায় সরকারের উদ্যোগ ছিল খুবই মন্থর। ঔপনিবেশিক সেচ ব্যবস্থার প্রসারে সরকারের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে তৎকালীন সময়ে সরকারের সেচের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ কাজই ছিল লোকদেখানো। জলাশয় নির্মিত হলেও সেগুলি জলসেচন অপেক্ষা মৎস্য চাষের উৎস তথা অর্থ উপার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হত বেশি। জলসেচনে সরকারের উদাসীনতা লক্ষ্য করে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই অক্টোবর 'Tanks Improvement Act' প্রনয়ন করা হয়।[২৩] তবে ঔপনিবেশিক পর্যায়ে বাঁধ তৈরি, জলাশয় খনন প্রভৃতি কাজে সমবায় সমিতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যদিও নলকূপ ও কুয়ো তৈরি তেমনভাবে বিস্তার লাভ করেনি। এর প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও সরকারের ঔদাসীন্য। সরকার জেলাবাসীদের আবেদন গ্রাহ্য না করায় রুক্ষ-শুষ্ক বাঁকুড়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ সেচের প্রসারের প্রয়োজন ছিল তা হয়ে ওঠেনি। বৃহৎ ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থার সাথে ক্ষুদ্র সেচের প্রসারে ঔপনিবেশিক শাসকদের সদিচ্ছা থাকলে বাঁকুড়া হয়ত অনেক বেশি

উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠত এবং জেলার কৃষকদের বারবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে অর্ধাহারে অনাহারে জীবন যাপন করতে হত না। তাদের জীবন অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে উঠতে পারত।

তথ্যসূত্রঃ

১. রবার্টসন, এফ. ডব্লু., *ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া ১৯১৭-২৪,* কলকাতা, ১৯২৬,পৃ. ২২।

২. রবার্টসন, এফ. ডব্লু., ঐ, পৃ. ৪ ।

৩. মন্ডল, রঞ্জন কুমার, *বাঁকুড়া জেলার কৃষি অর্থনীতি (১৮৮৫-১৯৫৩) : জলসেচ, শ্রমিক ও মূলধন* (গবেষণাপত্র), বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৭, পৃ. ১২৩।

৪. পোড়েল, সুদীপ্ত, *অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি (প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঔপনিবেশিক কালপর্ব),* কলকাতা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৩৬-২৩৭ ।

৫. রবার্টসন, এফ. ডব্লু., ঐ, পৃ. ২২।

৬. রবার্টসন, এফ. ডব্লু., ঐ, পৃ. ২২।

৭. মন্ডল, রঞ্জন কুমার, ঐ, পৃ. ১২৯ ।

৮. মন্ডল, রঞ্জন কুমার, ঐ, পৃ. ১৩০ ।

৯. পোড়েল, সুদীপ্ত, ঐ, পৃ. ২৩৬ ।

১০. পোড়েল, সুদীপ্ত, ঐ, পৃ. ২৩৬ ।

১১. পোড়েল, সুদীপ্ত, ঐ, পৃ. ২৩৬ ।

১২. *অ্যানুয়াল ইরিগেশন রেভিনিউ রিপোর্ট ১৯৩৪-৩৫*, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, আলিপুর, ১৯৩৬, পৃ. ৭।

১৩. জানা, অচিন্ত্য, *সমবায় আন্দোলনে বাঁকুড়া*, রাঢ় একাডেমি, বাঁকুড়া, জুন ১৯৯৯, পৃ. ৬৪।

১৪. মন্ডল, রঞ্জন কুমার, ঐ, পৃ. ১৫৫।

১৫. জানা, অচিন্ত্য, ঐ, পৃ. ৬৫ ।

১৬. রবার্টসন, এফ. ডব্লু., ঐ, পৃ. ২৩।

১৭. মন্ডল, রঞ্জন কুমার, ঐ, পৃ. ১৫৫ ।

১৮. *Agriculture Statistics of India, vol-1, 1912-13*, p. 50-51.

Agriculture Statistics of India, vol-1, 1915-16, p. 46-47.

Agriculture Statistics of India, vol-1, 1918-19, p. 46-47.

Agriculture Statistics of India, vol-1, 1920-21, p.18.

Agriculture Statistics of India, vol-1, 1928-29, p. 26.

Agriculture Statistics of India, vol-1, 1933-34, p. 72.

Agriculture Statistics of India, vol-1, 1935-36, p. 76.

Agriculture Statistics of India, vol-1, 1937-38, p. 38.

Agriculture Statistics of India, vol-1, 1938-39, p. 68.

১৯. রবার্টসন, এফ. ডব্লু., ঐ, অ্যাপেন্ডিক্স - III, পৃ. VIII.

২০. ঈশাক, এইচ. এস. এম., *এগরিকালচার স্ট্যাটিসটিকস বাই প্লট টু প্লট এনুমারেশন ইন বেঙ্গল ১৯৪৪-৪৫, পার্ট - II,* কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৩৫।

২১. ও ম্যালি, এল. এস. এস., *বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স,* কলকাতা, ১৯০৮, পৃ. ১০৮ ।

২২. ঈশাক এইচ. এস. এম., সেন চারুচন্দ্র, *প্লট টু প্লট এনুমারেশন ইন বেঙ্গল: ১৯৪৪-৪৫,* কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ১৭৬-১৭৭ ।

২৩. মন্ডল, রঞ্জন কুমার, ঐ, পৃ. ২৯১ ।

লেখক পরিচিতি:

সাথী মন্ডল বর্তমানে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে গবেষক হিসাবে যুক্ত।